আমাদের মেয়েলি ব'লে কেন উপহাস করা হয়েছে। সম্ভবত লেখিকার মতে আমরা স্ত্রীজাতির গুণগুলি শিক্ষা করতে পারি নি, শুধু তাদের দোষগুলিই আত্মসাৎ করেছি। আমাদের ত্রুটিগুলির অনুকরণ অপরকে করতে দেখলে আমরা সকলেই বিরক্ত হই; কেননা, শ্রদ্ধাপূর্বক ও-কার্য করলেও তা ভ্যাংচানির মতই দেখায়। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে, মানুষে অপরের গুণের অনুসরণ করতে পারলেও অনুকরণ শুধু পরের দোষেরই করতে পারে। এর পরিচয় জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। কিন্তু অবস্থার গুণে আমরা কিছু করতে হলেই অনুকরণ করতে বাধ্য। আমরা এক্সপেরিমেণ্টের সাহায্যে নিজের জীবন গঠন করতে সাহস পাই নে ব'লে আমাদের সুমুখে একটা তৈরি-আদর্শ থাকা আবশ্যক, যার অনুকরণে আমরা নিজেদের গড়ে নিতে পারি। আমরা এরকম দুটি আদর্শের সন্ধান পেয়েছি: একটি হচ্ছে বর্তমান ইউরোপীয়, অপরটি প্রাচীন হিন্দু। তার উপর যদি আবার স্ত্রীজাতিকেও আদর্শ করতে হয়, তা হলে এই তিন জাতির দোষ একাধারে মিলিত হয়ে যে চিজ্ দাঁড়াবে, জগতে আর তার তুলনা থাকবে না। সৃষ্টি হচ্ছে ত্রিগুণাত্মক, আমরা ত্রিদোষাত্মক হলে যে সৃষ্টিছাড়া হব, তার আর কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং এখন বিবেচ্য তোমাদের হাতে শাসনকর্তৃত্ব দেওয়া কর্তব্য কি না। এতে পৃথিবীর অপর দেশের পুরুষজাতির ক্ষতিবৃদ্ধি কি হবে তা বলতে পারি নে, কিন্তু আমাদের কোনো লোকসান নেই। কারণ আমরা তো চিরদিনই তোমাদের শাসনাধীন রয়েছি। আমাদের দুর্গতির একটি প্রধান কারণও ওই। লেখিকা তো নিজেই স্বীকার করেছেন, স্ত্রীলোকে অশিক্ষার গুণে এদেশের পুরুষ-সমাজকে চালমাৎ করে রেখেছে। আসল কথা, স্ত্রীলোকেরও পুরুষের অধীন থাকা ভালো নয়, পুরুষেরও স্ত্রীলোকের অধীন থাকা ভালো নয়। দাসত্বও মনুষ্যত্বকে যেমন বিকৃত করে, প্রভুত্বও তেমনি করে। স্ত্রীপুরুষে যে অহর্নিশি লড়াই করে— তার কারণ, একজন আর-একজনের অধীন। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, যুদ্ধ ততদিন থাকবে যতদিন এ পৃথিবীতে একদিকে প্রভুত্ব আর অপরদিকে দাসত্ব থাকবে।

কিন্তু ও ব্যাপার যে পৃথিবীতে আর বেশি দিন থাকবে না, এই যুদ্ধেই তা প্রমাণ হয়ে যাবে। যুদ্ধ আসলে একটি ভীষণ তর্ক বই আর কিছুই নয়। যে বিষয়ের শুধু কাগজে-কলমে মীমাংসা হয় না, তার সময়ে সময়ে হাতে-কলমে মীমাংসা করতে হয়। ইউরোপে কামান-বন্দুকে যে তর্ক চলছে, তার বিষয় হচ্ছে— 'যুদ্ধ করা উচিত কি অনুচিত'। এক্ষেত্রে পূর্বপক্ষ হচ্ছে জর্মানি আর উত্তরপক্ষ হচ্ছে ইংলণ্ড ফ্রান্স বেলজিঅম ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যদি উত্তরপক্ষ জয়ী হয় (এবং জয় যে ন্যায়ের অনুসরণ করবে,

সেসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই), তা হলে মানবজাতি এই চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হবে যে, যুদ্ধ অকর্তব্য। আর-একটি কথা, পুরুষমানুষে যুদ্ধ-রূপ প্রচণ্ড বিবাদ কখনো-কখনো করে, কিন্তু লেখিকার স্বজাতিই হচ্ছে সকল নিত্যনৈমিত্তিক বিবাদের মূল। এর জন্য আমাদের বুদ্ধি কিংবা তাঁদের হৃদয় দায়ী, তার বিচার আমি করতে চাই নে। আমরা মনসা হতে পারি, কিন্তু ধুনোর গন্ধ ওঁরাই যোগান। ওঁরা উস্‌কে দিয়ে পুরুষকে যে পরিমাণে 'বীরপুরুষ' করে তুলতে পারেন, তা কোনোও দর্শন-বিজ্ঞানে পারে না। তবে যে লেখিকা শমদম প্রভৃতি সদ্‌গুণে নিজেদের বিভূষিত মনে করেন, সে ভুল ধারণার জন্যও দায়ী আমরা। আমি পূর্বে বলেছি যে, স্ত্রীজাতিকে আমরা সমাজে স্বাধীনতা দিই নি, কিন্তু সাহিত্যে দিয়েছি। এ কাজটি ন্যায় হলেও সেইসঙ্গে একটি অন্যায় কাজও আমরা করেছি। আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির কোনোরূপ মর্যাদা নেই, কিন্তু সাহিত্যে যথেষ্টর চাইতেও বেশি আছে। এর কারণ, সকল সমাজের উপর হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হলে তোমাদের গুণকীর্তন করা ছাড়া আর আমাদের উপায়ান্তর নেই। আমাদের নিজের বিষয় মুখ ফুটে অহংকার করা চলে না ; কেননা, আমাদের দেহমনের দৈন্য বিশ্বমানবের কাছে প্রত্যক্ষ ; সুতরাং আমরা বলতে বাধ্য যে, আমাদের সমাজের সকল ঐশ্বর্য অন্তঃপুরের ভিতর চাবি-দেওয়া আছে। এসব কথার উদ্দেশ্য আমাদের নিজের মন-যোগানো এবং পরের মন-ভোলানো। ও হচ্ছে তোমাদের নামে বেনামি করে আমাদের আত্মপ্রশংসা করা। সুতরাং, যদি মনে কর, ওইসব প্রশংসিত গুণে তোমাদের কোনো স্বত্ব জন্মেছে, তা হলে তোমরা যে-তিমিরে আছ, সেই-তিমিরেই থাকবে।

কার্তিক ১৩২১

চুট্‌কি

সমালোচকেরা আমার রচনার এই একটি দোষ ধরেন যে, আমি কথায়-কথায় বলি 'হচ্ছে'। এটি যে একটি মহাদোষ সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই ; কেননা ওকথা বলায় সত্যের অপলাপ করা হয়। সত্যকথা বলতে গেলে বলতে হয়, বাংলায় কিছু 'হচ্ছে না'। এদেশের কর্মজগতে যে কিছু হচ্ছে না, সে তো প্রত্যক্ষ ; কিন্তু মনোজগতেও যে কিছু হচ্ছে না, তার প্রমাণ বর্ধমানের গত সাহিত্যসম্মিলন।

উক্ত মহাসভার পঞ্চ সভাপতি সমস্বরে বলেছেন যে, বাংলায় কিছু হচ্ছে না— না দর্শন, না বিজ্ঞান, না সাহিত্য, না ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রধান বক্তব্য এই যে, আমরা না-পাই সত্যের সাক্ষাৎ, না-করি সত্যাসত্যের বিচার। আমরা সত্যের স্রষ্টাও নই, দ্রষ্টাও নই ; কাজেই আমাদের দর্শন-চর্চা realও নয়, criticalও নয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, কি 'মূর্ত-বিজ্ঞান' কি 'অমূর্ত-বিজ্ঞান', এ দুয়ের কোনোটিই বাঙালি অদ্যাবধি আত্মসাৎ করতে পারে নি ; অর্থাৎ বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগও আমাদের হাতে পড়ে নি, তার তন্ত্রভাগও আমাদের মনে ধরে নি। আমরা শুধু বিজ্ঞানের স্থূলসূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করেছি, এবং তার পরিভাষার নামতা মুখস্থ করেছি। যে বিদ্যা প্রয়োগপ্রধান, কেবলমাত্র তার মন্ত্রের শ্রবণে এবং উচ্চারণে বাঙালিজাতির মোক্ষলাভ হবে না। এককথায় আমাদের বিজ্ঞানচর্চা real নয়।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে ইতিহাস-চর্চার উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার এবং উদ্ধার ; এ সত্য নিত্য এবং গুপ্ত সত্য নয়, অনিত্য এবং লুপ্ত সত্য। অতএব এ সত্যে দর্শন লাভের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক। অতীতের জ্ঞানলাভ করবার জন্য হীরেন্দ্রবাবুর বর্ণিত বোধির (intuition) প্রয়োজন নেই— প্রয়োজন আছে শুধু শিক্ষিত বুদ্ধির। অতীতের অন্ধকারের উপর বুদ্ধির আলো ফেলাই হচ্ছে ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্তব্য, সে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। অথচ আমরা সে অন্ধকারে শুধু ঢিল নয়, পাথর ছুঁড়ছি। ফলে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের ঐতিহাসিকদের দেহ পরস্পরের শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছে। এককথায় আমাদের ইতিহাসচর্চা critical নয়।

অতএব দেখা গেল যে, সম্মিলনের সকল শাখাপতি এবিষয়ে একমত যে, কিছু হচ্ছে না। কিন্তু কি যে হচ্ছে, সেকথা বলেছেন স্বয়ং সভাপতি। তিনি বলেন, বাংলাসাহিত্যে যা হচ্ছে, তার নাম চুট্‌কি। একথা লাখ কথার এক কথা। সকলেই

জানেন যে, যখন আমরা ঠিক কথাটি ধরতে না পারি, তখনই আমরা লাখ কথা বলি। এই 'চুট্‌কি'-নামক বিশেষণটি খুঁজে না পাওয়ায় আমরা বঙ্গসরস্বতীর গায়ে 'বিজাতীয়' 'অভিজাতীয়' 'অবাস্তব' 'অবান্তর' প্রভৃতি নানা নামের ছাপ মেরেছি, অথচ তার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি না।

তার কারণ, এসকল ছোট-ছোট বিশেষণের অর্থ কি, তার ব্যাখ্যা করতে বড়-বড় প্রবন্ধ লিখতে হয়; কিন্তু চুট্‌কি যে কি পদার্থ, তা যে আমরা সকলেই জানি, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই দেওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিভাষণ যে চুট্‌কি নয়, একথা স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয়ও স্বীকার করতে বাধ্য; কেননা একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভাবে ও ভাষায় এর চাইতে ভারী অঙ্গের গদ্যবন্ধ জর্মানির বাইরে পাওয়া দুষ্কর।

হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণও চুট্‌কি নয়। তবে শাস্ত্রীমহাশয় এ মতে সায় দেবেন কি না জানি নে; কেননা, হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ একে সংক্ষিপ্ত তার উপর আবার সহজবোধ্য, অর্থাৎ সকল দেশের সকল যুগের সকল দার্শনিক তত্ত্ব যে-পরিমাণে বোঝা যায়, হীরেন্দ্রবাবুর দার্শনিক তত্ত্বও ঠিক সেই-পরিমাণে বোঝা যায়— তার কমও নয় বেশিও নয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে যে-কাব্য মহাকায় তাই হচ্ছে মহাকাব্য। গজমাপে যদি সাহিত্যের মর্যাদা নির্ণয় করতে হয়, তা হলে হীরেন্দ্রবাবুর রচনা অবশ্য চুট্‌কি, কেননা, তার ওজন যতই হোক না কেন, তার আকার ছোট।

অপরপক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিভাষণযুগল যে চুট্‌কি-অঙ্গের, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শাস্ত্রীমহাশয়ের নিজের কথা এই— 'একখানি বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব ততদিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে, এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব'—এরকম যাতে হয় না, তারই নাম চুট্‌কি। একথা যদি সত্য হয়, তা হলে জিজ্ঞাসা করি, বাংলায় এরকম ক'জন পাঠক আছেন— যাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবন্ধ পড়ে তাঁদের ভিতরটা সব ওলটপালট হয়ে গেছে।

শাস্ত্রীমহাশয় বাংলাসাহিত্যে চুট্‌কির চেয়ে কিছু বড় জিনিস চান। বড় বইয়ের যদি ধর্মই এই হয় যে, তা পড়বামাত্র আমাদের মনের ভাবের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে, তা হলে সেরকম বই যত কম লেখা হয় ততই ভালো; কারণ দিনে একবার করে যদি পাঠকের অন্তরাত্মার আমূল পরিবর্তন ঘটে, তা হলে বড় বই লেখবার লোক যেমন বাড়বে, পড়বার লোকও তেমনি কমে আসবে। তিনি চুট্‌কির সম্বন্ধে যে দুটি ভালো

কথা বলেন নি তা নয়, কিন্তু সে অতি মুরুব্বিয়ানা করে। ইংরেজেরা বলেন, স্বল্পস্তুতির অর্থ অতিনিন্দা। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ চুট্‌কি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের পক্ষে একটু যাচিয়ে দেখা দরকার। তিনি বলেন, চুট্‌কির একটি দোষ আছে, 'যখনকার তখনই, বেশি দিন থাকে না'। একথা যে ঠিক নয় তা তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণ করা যায়। সংস্কৃত অভিধানে চুট্‌কি শব্দ নেই, কিন্তু ও-বস্তু যে সংস্কৃতসাহিত্যে আছে, সেকথা শাস্ত্রীমহাশয়ই আমাদের বলে দিয়েছেন। তাঁর মতে 'কালিদাস ও ভবভূতির পর চুট্‌কি আরম্ভ হইয়াছিল; কেননা, শতক দশক অষ্টক সপ্তশতী এইসব তো চুট্‌কিসংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়'। তথাস্তু। শাস্ত্রীমহাশয়ের বর্ণিত সংস্কৃত চুট্‌কির দুটি-একটি নমুনার সাহায্যেই দেখানো যেতে পারে যে, আর্যযুগেও চুট্‌কি কাব্যাচার্যদিগের নিকট অতি উপাদেয় মহার্হ বস্তু বলেই প্রতিপন্ন হত। ভর্তৃহরির শতক-তিনটি সকলের নিকটই সুপরিচিত, এবং 'গাথা-সপ্তশতী'ও বাংলাদেশে একেবারে অপরিচিত নয়। ভর্তৃহরি ভবভূতির পূর্ববর্তী কবি; কেননা, জনরব এই যে তিনি কালিদাসের ভ্রাতা, এবং ইতিহাসের অভাবে কিংবদন্তীই প্রামাণ্য। সে যাই হোক, 'গাথা-সপ্তশতী' যে কালিদাসের জন্মের অন্তত দু-তিন শ বছর পূর্বে সংগৃহীত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তা হলে দাঁড়াল এই যে, আগে আসে চুট্‌কি তার পর আসে মহাকাব্য এবং মহানাটক। অভিব্যক্তির নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, এ জগতে সব জিনিসই ছোট থেকে ক্রমে বড় হয়! সাহিত্যও ঐ একই নিয়মের অধীন। তার পর পূর্বোক্ত শতকত্রয় এবং পূর্বোক্ত সপ্তশতী যখনকার তখনকারই নয়, চিরদিনকারই। এ মত আমার নয়, বাণভট্টের। গাথা-সপ্তশতী শুধু চুট্‌কি নয়— একেবারে প্রাকৃত-চুট্‌কি, তথাপি শ্রীহর্ষকারের মতে—

'অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎসাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধ জাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥'

তার পর ভর্তৃহরি যে এক-ন'র পান্না এক-ন'র চুনি এবং এক-ন'র নীলা— এই তিন-ন'র রত্নমালা সরস্বতীর কণ্ঠে পরিয়ে গেছেন, তার প্রতি-রত্নটি যে বিশুদ্ধজাতীয় এবং অবিনাশী, তার আর সন্দেহ নেই। যাবচ্চন্দ্রদিবাকর এই তিনশত বর্ণোজ্জ্বল শ্লোক সরস্বতীর মন্দির অহর্নিশি আলোকিত করে রাখবে।

আসল কথা, চুট্‌কি যদি হেয় হয়, তা হলে কাব্যের চুট্‌কিত্ব তার আকারের উপর নয় তার প্রকারের অথবা বিকারের উপর নির্ভর করে, নচেৎ সমগ্র সংস্কৃতকাব্যকে চুট্‌কি বলতে হয়। কেননা, সংস্কৃতভাষায় চার ছত্রের বেশি কবিতা নেই— কাব্যেও নয় নাটকেও নয়। শুধু কাব্য কেন, হাতে-বহরে বেদও চুট্‌কির অন্তর্ভূত হয়ে পড়ে।

শাস্ত্রীমহাশয় বলেন যে, বাঙালি-ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান ব'লে বেদাভ্যাস করেন না। কর্ণবেধের জন্য যতটুকু বেদ দরকার, ততটুকুই এদেশে ব্রাহ্মণসন্তানের করায়ত্ত। অথচ বাঙালি বেদপাঠ না করেও একথা জানে যে, ঋক্ হচ্ছে ছোটকবিতা এবং সাম গান। সুতরাং আমরা যখন ছোটকবিতা ও গান রচনা করি, তখন আমরা ভারতবর্ষের কাব্যরচনার সনাতন রীতিই অনুসরণ করি।

শাস্ত্রীমহাশয় মুখে যাই বলুন, কাজে তিনি চুটকিরই পক্ষপাতী। তিনি আজীবন চুটকিতেই গলা সেধেছেন, চুটকিতেই হাত তৈরি করেছেন, সুতরাং কি লেখায়, কি বক্তৃতায়, আমরা তাঁর এই অভ্যস্ত বিদ্যারই পরিচয় পাই। তিনি বাঙালির যে বিংশপর্ব মহাগৌরব রচনা করেছেন, তা ঐতিহাসিক চুটকি বই আর কিছুই নয়; অন্তত সে রচনাকে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অন্য কোনো নামে অভিহিত করবেন না।

একথা নিশ্চিত যে, তিনি সরকারমহাশয়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন নি, সম্ভবত এই বিশ্বাসে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে আবিষ্কৃত সত্য বাঙালির পক্ষে পুষ্টিকর হতে পারে, কিন্তু রুচিকর হবে না। সরকারমহাশয় বলেন যে, এদেশের ইতিহাসের সত্য যতই অপ্রিয় হোক বাঙালিকে তা বলতেও হবে, শুনতেও হবে। অপরপক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের উদ্দেশ্য তাঁর রচনা লোকের মুখরোচক করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তিনি নানারকম সত্য ও কল্পনা একসঙ্গে মিলিয়ে ঐতিহাসিক সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ রচনায় যে মাল আছে, তাও মসলা থেকে পৃথক করে নেওয়া যায় না। শাস্ত্রীমহাশয়ের কথিত বাংলার পুরাবৃত্তের কোনো ভিত্তি আছে কি না বলা কঠিন। তবে এ ইতিহাসের যে গোড়াপত্তন করা হয় নি, সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। ইতিহাসের ছবি আঁকতে হলে প্রথমে ভূগোলের জমি করতে হয়। কোনো-একটি দেশের সীমার মধ্যে কালকে আবদ্ধ না করতে পারলে সে-কালের পরিচয় দেওয়া যায় না। অসীম আকাশের জিয়োগ্রাফি নেই, অনন্ত কালেরও হিস্টরি নেই। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় সেকালের বাঙালির পরিচয় দিতে গিয়ে সেকালের বাংলার পরিচয় দেন নি, ফলে গৌরবটা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে আমাদের কি অপরের প্রাপ্য— এবিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। শাস্ত্রীমহাশয়ের শক্ত হাতে পড়ে দেখতে পাচ্ছি অঙ্গ ভয়ে বঙ্গের ভিতর সেঁধিয়েছে; কেননা, যে 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' আমাদের সর্বপ্রথম গৌরব, সে শাস্ত্র অঙ্গরাজ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলার লম্বাচৌড়া অতীতের গুণবর্ণনা করতে হলে বাংলাদেশটাকেও একটু লম্বাচৌড়া করে নিতে হয়, সম্ভবত সেইজন্য শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের পূর্বপুরুষদের হয়ে অঙ্গকেও বেদখল করে

বসেছেন। তাই হদি হয়, তা হলে বরেন্দ্রভূমিকে ছেঁটে দেওয়া হল কেন। শুনতে পাই বাংলার অসংখ্য প্রত্নরাশি বরেন্দ্রভূমি নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে। বাংলার পূর্বগৌরবের পরিচয় দিতে গিয়ে বাংলার যে ভূমি সবচেয়ে প্রত্নগর্ভা, সে প্রদেশের নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করবার কারণ কি। যদি এই হয় যে, পূর্বে উত্তরবঙ্গের আদৌ কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এবং থাকলেও সেদেশ বঙ্গের বহির্ভূত ছিল, তা হলে সেকথাটাও বলে দেওয়া উচিত। নচেৎ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমাদের মনে একটা ভুল ধারণা এমনি বদ্ধমূল করে দেবে যে, তার 'আমূল পরিবর্তন' কোনো চুট্‌কি ইতিহাসের দ্বারা সাধিত হবে না।

শাস্ত্রীমহাশয় যে তাম্রশাসনে শাসিত নন, তার প্রমাণ তিনি পাতায় পাতায় বলেন, 'আমি বলি' 'আমার মতে' এই সত্য। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারে না, অর্থাৎ এককথায় তা কাব্য; এবং যখন তা কাব্য, তখন তা যে চুট্‌কি হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

শাস্ত্রীমহাশয়ের, দেখতে পাই, আর-একটি এই অভ্যাস আছে যে, তিনি নামের সাদৃশ্য থেকে পৃথক-পৃথক বস্তু এবং ব্যক্তির ঐক্য প্রমাণ করেন। একীকরণের এ পদ্ধতি অবশ্য বৈজ্ঞানিক নয়। কৃষ্ট এবং খৃষ্ট, এ দুটি নামের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও ও-দুটি অবতারের প্রভেদ শুধু বর্ণগত নয়, বর্গগতও বটে। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের অবলম্বিত পদ্ধতির এই একটি মহাগুণ যে, ঐ উপায়ে অনেক পূর্বগৌরব আমাদের হাতে আসে, যা বৈজ্ঞানিক হিসেবে ন্যায়ত অপরের প্রাপ্য। কিন্তু উক্ত উপায়ে অতীতকে হস্তান্তর করার ভিতর বিপদও আছে। একদিকে যেমন গৌরব আসে, অপরদিকে তেমনি অগৌরবও আসতে পারে। অগৌরব শুধু যে আসতে পারে তাই নয়, বস্তুত এসেওছে।

স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয় 'ঐতরেয় আরণ্যক' হতে এই সত্য উদ্ধার করেছেন যে, প্রাচীন আর্যেরা বাঙালিজাতিকে পাখি বলে গালি দিতেন। সে বচনটি এই—

'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা'

প্রথম-পরিচয়ে আর্যেরা যে বাঙালিজাতির সম্বন্ধে অনেক অকথা কুকথা বলেন, তার পরিচয় আমরা এ যুগেও পেয়েছি, *vide* Macaulay। সুতরাং প্রাচীন আর্যেরাও যে প্রথম-পরিচয়ে বাঙালিদের প্রতি নানারূপ কটুকাটব্য প্রয়োগ করেছিলেন, একথা সহজেই বিশ্বাস হয়। তবে এক্ষেত্রে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, যদি গালি দেওয়াই তাঁদের অভিপ্রায় ছিল, তা হলে আর্যেরা আমাদের পাখি বললেন কেন। পাখি বলে গাল দেবার প্রথা তো কোনো সভ্যসমাজে প্রচলিত দেখা যায় না। বরং 'বুলবুল'